International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-I, July 2017, Page No. 9-15
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

হরিশংকর জলদাসের "জলপুত্র:" আঞ্চলিকতার বর্ণময় বিস্তার

ডঃ সুশান্ত ঘোষ
অধ্যাপক, আম্বেদকর মহাবিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

Harishankar Jaladas one of the best regional novelist in modern Bangladeshi Bengali Literature. He was a professor and popular author of the current and contemporary Bengali Literature. 'Jalputra' is the first Literary work by sri Jaladas. Actually He is the representative of marginal and subaltern community. 'Jalputra' a complete regional novel based on marginal fishermen of uttar patenga village of chittgoan in Bengladesh. He also a son of the soil of this community and region. River based novel in Bengali is a glorious past of Harishankar composed his novel 'Jalputra' first time based on sea. He include the subject of Kaivartya community and their culture language of the bank of the Bay of Bengal. We analysis these matter in our short explanation here.

হাল আমলের বাংলা কথা সাহিত্যের উজ্জ্বল প্রতিভা শ্রীযুক্ত হরিশংকর জলদাস এক অভাবনীয় নতুনত্ব ও মননের নিষ্ঠাবান স্বতঃস্ফূর্ততায় বাংলা নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের স্তিমিত ধারায় নিয়ে এসেছেন বঙ্গোপসাগরের ঊর্মিমালার দীর্ঘ ও উত্তাল স্রোতধারা। তাঁর রচিত 'জলপত্র' বাংলা নদীকেন্দ্রিক আঞ্চলিক উপন্যাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতেই পারে। নদীর কথা কিংবা নদী তীরবর্তী জেলে সমাজের জীবনচর্চা এবং আর্থসামাজিক অবস্থান নিয়ে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস অনেকগুলি রচিত হয়েছে। কিন্তু সমুদ্র তীরবর্তী মানবজীবনের আলেখ্য 'জলপুত্র' উপন্যাসের কাহিনি যেরূপ বাস্তবতা ও মননের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে ইতোপূর্বে বাংলা উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া বিরল। প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রকেন্দ্রিক উপন্যাস বাংলায় ছিল না। হরিশংকর জলদাস সমুদ্রকেন্দ্রিক উপন্যাসের প্রথম ও যথার্থ স্রষ্ট্রা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পতেঙ্গাগ্রামের 'জলপুত্র' হরিশংকর জলদাস তাঁর স্বসমাজের জীবন ও সামাজিক অবস্থানের পূর্নমূল্যায়ন করেছেন এই উপন্যাসে। আজন্ম সমুদ্রের লবনাক্ত জলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হরিশংকর প্রথম উচ্চশিক্ষিত কৈবর্ত্য সমাজের। 'জলপুত্র' উপন্যাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার নির্ভেজাল ও বাস্তবসত্য। তিনি এক গভীর অসম্মান থেকে উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন। গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছিলেন পতেঙ্গার সমুদ্রতীরবর্তী আঞ্চলিক মানুষগুলোর শোচনীয় পরিণতি। সভ্য সমাজের কাছে অবহেলিত কৈবর্ত্যসম্প্রদায়ের মানুষকে চিরঅমর করে তুলতে পেরেছেন এখানে। সমুদ্রের ঊর্মিমালার মতো কৈবর্ত্য সমাজের সুখ দুঃখ আঞ্চলিকতার রঙে বর্ণময় হয়ে উঠেছে। অচেনা জেলের জীবনযাত্রা ও জীবনসংগ্রামের এক অভূত পূর্ব বাস্তবতার প্রকাশ করতে পেরেছেন হরিশংকর জলদাস। জেলের 'পোওলা' হরিশংকর চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক এবং পরবর্তী কালে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিও তিনি লাভ করেন। ফলে একদিকে আজন্ম পরিচিত সমুদ্র ও তার তীরবর্তী

স্বসম্প্রদায়ের মানুষের জীবনজীবিকা অন্যদিকে কৃতবিদ্য মনস্বীতা এই দুয়ের সহবস্থানে 'জলপুত্র' উপন্যাস এক অসাধারণ সংশ্লেষণ লক্ষ করা যায়। একদিকে প্রতিপক্ষকে যোগ্য জবাব দেওয়া অন্যদিকে নিজ সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক ইতিহাস রচনা করার উদ্যমী প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হয়েছে জলপুত্র উপন্যাসে। তিনি এই উপন্যাসের ভূমিকা লিখতে গিয়ে সেকথা জানিয়েছেন-

"প্রান্তসমাজে জন্ম আমার। একেবারে কিশোর বয়স থেকে সমুদ্র সংগ্রামে বাবার 'সহযোদ্ধা' জলচর থেকে স্থলচর হবার জন্য আমার কানের কাছে বাবা যুধিষ্ঠির অবিরাম মন্ত্র পড়ে যেতেন। এস.এস.সি পাশ করে প্রাথমিক শিক্ষক হবার প্রবলবাসনা মনের মধ্যে আকুলি বিকুলি করত। ভাগ্যক্রমে এম.এ পাশ করা গেল। সরকারি কলেজে চাকরিও পাওয়া হলো।

ভদ্র শিক্ষিত সমাজে চাকরি করতে এসে বিবর্ণ প্রান্তিক সমাজে জন্মগ্রহণ করার অপরাধের দায় থেকে মুক্তি ঘটেনি। ঊর্দ্ধতন কর্মকর্ত্রী পিতৃদত্ত নাম ধরে না ডেকে আড়ালে আড়ালে জাউল্যার পোলা' বলে ডাকতেন। সহকর্মীরার সে কথা কানে পৌঁছুলে একটি প্রশ্ন আমার মধ্যে জেগে উঠল। তাহলে কি জেলেরা সত্যি নিন্দনীয়। মাছমারাদের উৎপত্তি বিকাশ বিস্তার নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম লেখা হল নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত্য জনজীবন। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হল বইটি। এ বিষয়ে কাজ করতে করতে আমার ভিতরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল 'জলপুত্র' এর বীজ।" (১)

একদিকে গবেষকের নিরপেক্ষতা ও বাস্তবতা অন্যদিকে প্রতিপক্ষের অপমানের যোগ্য জবাব দেবার বাসনা এই দুটি বিষয় যখন একত্রে কাজ করে তখন তার তেজ অতলস্পর্শী হতে বাধ্য। 'জলপুত্র' এমনই তেজি উপন্যাস, যা কেবল নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস কিংবা আঞ্চলিক উপন্যাসের সাধারণ শ্রেণিভূক্ত করা হলে ভুল হবে। জলপুত্র একটি সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার গভীরতম মূল্যায়ন ও ঐতিহাসিক দলিল। মহাকাব্যিক চেতনার রঙে রাঙানো এই উপন্যাস দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে চিরন্তন সত্যে উপনীত হয়েছে।

আঞ্চলিক উপন্যাসের যাবতীয় উপাদান জলপুত্রে সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আঞ্চলিক চরিত্র, আঞ্চলিক পেশা আঞ্চলিক সংস্কৃতি, আঞ্চলিক চাহিদা সবই বাস্তব ও অঞ্চলমূল্য এই উপন্যাসে। আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক শব্দটির একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 'oxford companion of American Literature' গ্রন্থে যেখানে বলা হয়েছে- "In local color literature one finds the dual influence of romantism and realism since the anther frequency looks away from ordinary life to distance lands strange, customs or exotic scenes but refine though minute details a sense sidelity and accuracy of description [2]

প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক উপন্যাসের বদ্ধমূল ধারণা নয় বরং আঞ্চলিক উপন্যাসকে বিচার করা দরকার তার আঞ্চলিকতার মাত্রা দিয়ে। আঞ্চলিকতার মাত্রা দিয়ে বাস্তবতাহীন ও কল্পিত হয় তাহলে তা আঞ্চলিক উপন্যাসের সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে। আমরা জলপুত্র উপন্যাসের আঞ্চলিক উপন্যাসত্ব অলোচনা করতে গিয়ে এই কারণে মাত্রা হিসাবে আঞ্চলিকতা কতখানি বাস্তবভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখব। কেননা একটি আঞ্চলিক উপন্যাস সৃষ্টি হয় আঞ্চলিক উপাদান থেকে রসদ গ্রহণ করে তাই অঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হয় প্রতিটি উপাদানকে তাতে আঞ্চলিক উপন্যাস তার সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়। 'জলপুত্র' উপন্যাসের আঞ্চলিকতা বর্ণনা করতে চারটি বিষয়ের আঞ্চলিকতার উপর জোর দিয়েছে এবং তাকেই পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছি। যথা-

(১) স্থান কেন্দ্রিক আঞ্চলিকতা
(২) চরিত্রকেন্দ্রিক আঞ্চলিকতা
(৩) সংস্কৃতিগত আঞ্চলিকতা

(৪) ভাষাগত আঞ্চলিকতা।

এই চারটি পর্যায়ে আঞ্চলিকতার প্রকাশ কতখানি বাস্তব ও যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন ঔপন্যাসিক তার মাত্রা দিয়েই জলপুত্রের অঞ্চলিকতার যথার্থতা প্রতিপাদন করব। ঔপন্যাসিক হরিশংকর জলদাস বলেছেন- "জলপুত্র উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলে পল্লীতে। এখানকার অধিবাসীরা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার কথা বলে । চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা বসালে অন্যজেলার পাঠকেরা চরিত্রগুলি তা বুঝবেন কিনা-এ প্রশ্ন আমাকে কুরে কুরে খেয়েছে।" বস্তুতঃ আঞ্চলিক উপন্যাসের মধ্যে অঞ্চলকে উপেক্ষা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। জলদাস সেই চেষ্টা ও করেননি। অঞ্চল এবং আঞ্চলিক মানুষ গুলিকে সর্বোচ্চ বাস্তবতায় চিত্রিত করেছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলা নদীকেন্দ্রিক আঞ্চলিক সাহিত্যের ধারায় মানিক বন্দোপাধ্যায় কিংবা অধৈত মল্লবর্মনের যে ধারা তার থেকে অনেকটা ভিন্নতর করে তুলছেন জলপুত্র উপন্যাসটিকে। ঔপন্যাসিক যে কথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন- "জলপুত্র সমুদ্র পাড়ের ছেলেদের নিয়ে সমুদ্রভিত্তিক উপন্যাস। জেলে জীবন নির্ভর সমুদ্রভিত্তিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর নেই- এ তথ্য জানার পর আমি সাহসী হয়ে উঠলাম। আমি 'জলপুত্র' লেখা শেষ করলাম।" প্রকৃতপক্ষে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, আঞ্চলিক সবদিকেই এই উপন্যাসটি একটি সার্থক বিবরণক্ষেত্র হরিশংকর জলদাসের।

হরিশংকর জলদাস তার 'জলপুত্র' উপন্যাসের স্থানহিসাবে নির্বাচন করেছেন তারই আজন্ম পরিচিত বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী চট্টগ্রামের পতেঙ্গা ও নিকটস্থ কৈবর্ত্য জনপদকে। তিনি এই অঞ্চলকে নির্বাচন করার কারণ হিসাবে বলেছেন এই অঞ্চলের মানুষ হবার জন্য অধ্যাপনা করার সময় অপমানিত হয়ে তার জবাব দিতে চেয়ে কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থান নিয়ে গবেষণা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। আর সেই সময় তিনি উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে এই অঞ্চলকেই নির্বাচন করেছেন। এতে একদিকে যেমন আঞ্চলিক উপন্যাসের পরিবেশ নির্মাণ করতে সহজ হয়েছে তেমনি উক্ত সমাজের মানুষ হবার কারণে ভাষা, সংস্কৃতি, আর্থসামাজিক রূপরেখাগুলি উপলব্ধি করতে সহজ হয়েছিল। একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার আঞ্চলিক হয়ে ওঠার প্রাথমিক শর্তপূরণ করা। সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক রঙগুলির যেন অবিকৃত বাস্তবতায় প্রকাশ পায়। হরিশংকর তাঁর সমুদ্রকেন্দ্রিক উপন্যাসে আঞ্চলিক রূপ দেবার ক্ষেত্রে স্থানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। স্থানগত পরিবেশ চরিত্রের জৈবনিক দ্বন্দ্ব ও আর্থসামাজিকি পরিস্থিতি ও পরিবেশই তার উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাসের মর্যদা পূরণ করেছে। গ্রামের নাম করতে গিয়ে তিনি যেগুলির উল্লেখ করেছেন, যেগুলি সেই সময়কার বাংলাদেশের গ্রাম হিসাবে স্বমহিমায় বিরাজমান- বন্দর, বুরুমচরা করল কোলা' এসব গ্রাম আধুনিকতার আলো পেলেও এখনো গ্রামীণ সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ। গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন – "শ্রাবণমাসের জন্যে নাউট্যাপোয়াদের ভাড়া করে আনা হয়। ভাড়া মাসে দে'ড়শো থেকে দুইশো টাকা শরীর খারাপ না করলে প্রতিরাতেই পুঁথি পাঠের সংগে তাদের নাচতে হয়... বন্দর বুরুমচরা, করল কোলা-এসব গ্রাম থেকে এদের আনা হত।" কিংবা জেলে পল্লীর বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক যখন বলেন-"উত্তর পতেঙ্গাঁ হতে মিশরাই পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে অনেক জেলেপল্লী, উত্তর পতেঙ্গাঁ, হালিশহর, কাট্টালি, খেঁজুরতলি, ভাটিয়ারী, কুমিরা, সীতাকুণ্ড, মিরসরাই ইত্যাদি গ্রামের জেলেপাড়া গুলো সমুদ্রের কোল ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে।" এই জেলে পাড়ার কৈবর্ত্য সমাজের, মানুষও তাদের জীবনচর্চা ও জীবনসংগ্রামের দাবি আঞ্চলিকতার হাত ধরে প্রকাশ পেয়েছ জলপুত্র উপন্যাসে।

আঞ্চলিকতার বর্ণময় রূপকে প্রকাশ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক আর্থসামাজিক পরিবেশ যেমন রচনা করেছেন তেমনি সমাজ ও সংস্কৃতিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। জেলে সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি যেমন আছে তেমনি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতিও তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে তাদের বিশুদ্ধ গ্রামীণ সংস্কৃতি যেমন আছে তেমনি উচ্চসমাজের সংস্কৃতিও আত্মীকরণ ঘটেছে নতুন মহনীয়তায়। এসব এসেছে বিশুদ্ধ আঞ্চলিতার রঙ ধরেই। মনসাপুঁথিপাঠও মনসাপূজা বাংলাদেশের একটি পরিচিত উৎসব। পূর্ববঙ্গের প্রতিটি

হিন্দু পরিবারেই মনসার পূজা হয় শ্রাবণমাসে। জেলে সমাজেও সেই রীতি প্রচলিত তারাও মনসাপূজা করে ও পুথিপাঠ করে। বাংলা দেশে মনসাপূজার প্রচলনের কারণ হিসাবে লৌকিক সংস্কৃতির কথা বলেছেন লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীরা। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বর্ষার সময়ে সাপের উপদ্রব হয় এবং মানুষ সর্পাঘাতের শিকার হয়। এই বিপদ থেকে রক্ষাপাবার জন্য সর্পদেবীর পূজা করা হয়ে থাকে। জেলে সমাজের মানুষরাও যেহেতু জলচর সেহেতু তাদেরও মনসার পূজা করতে হয়। লৌকিক সংস্কৃতির রূপটি এখানে ঔপন্যাসিক যথার্থতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন-

"মনসা তাদের অন্যতম প্রধান দেবী। সর্পের দেবী মনসাকে বড় ভয়। তার জন্য তাদের বড় সম্ভ্রম। সর্প জলজ হিংস্র প্রাণী। জেলেরা জলচর। সর্পের দংশনে অনেক জেলের মৃত্যু ঘটে। তারা বিশ্বাস করে মনসাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে সর্পের কোপানল থেকে তারা রেহাই পাবে। তাই, গোটা শ্রাবণমাস জেলেদের ঘরে ঘরে সর্পদেবী মনসার পূজা হয় সাড়ম্বরে। প্রতিরাতে মনসা উপলক্ষে 'নাউট্যাপোয়ার নাচ' প্রচলিত আছে কৈবর্ত্য সমাজে "পুঁথিপাঠের প্রধান আকর্ষণই এই নাউট্যাপোয়া। 'শ্রাবনমাসে এরা' মেয়েদের পোষাক পরে মুখে কড়া পাউডার মেখে বুকে মেকি স্তন লাগিয়ে তারা আসরে ঘুরে ঘুরে নাচে।"

নাউট্যাপোয়ার নাচ উপলক্ষে টাকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। কেবল খুশি হয়ে এদের টাকা দিত শুধু তাই নয়। অনেক সময় রীতি মেনেই টাকা দেওয়া হয় এদের। টাকার মালা গলায় জড়ানো হয়। কৈবর্ত্য সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। তারা বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করত মাছ ধরার সময়। পেনিরজাল, ঝাঁকিরজাল, হুরিজাল, টাইঙ্গাজাল, বিহিন্দীজাল, টংজাল, কাঠিজাল প্রভৃতি জালের নাম উল্লেখ করেছেন এগুলি এ অঞ্চলেই পরিচিত নাম। এতে আঞ্চলিক নামগুলি প্রকাশ পেয়েছে। লোকবিশ্বাস ও লৌকিক পূজার কথাও হরিশংকর তার জলপুত্র উপন্যাসে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন, কৈবর্ত্য 'জলপুত্ররা' নতুন নৌকা কিনে ছ্যাঁকা করে। যাতে লোকের কুনজরে না পড়ে নৌকাটি। আষাঢ় মাসে মঙ্গলবারে গঙ্গাদেবীর পূজায় রত হন এখানকার জেলেরা। এইপূজা উপলক্ষে বলিদান প্রথাও প্রচলিত ছিল। তারা মাছধরার নৌকায় দুটি বিশাল আকৃতির চোখ একে রাখত। কারণ- "জলপুত্রদের বিশ্বাস- এই চোখ দিয়ে নৌকা গভীর সমুদ্রে তাদের মালিকের জাল খুঁজে নেয়। নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে হারিয়ে গেলে কোনও নারীর স্বামী তখন দীর্ঘ বার বছর পর বৈধব্য নেবার বিশেষ লৌকিক পদ্ধতিও কৈবর্ত্য সমাজে প্রচলিত আছে।-"স্বামী সমুদ্রে হারিয়ে গেলে জেলেনীরা আশায় আশায় দিন গোনে। স্বামী মরেনি, এড়ে দূর সমুদ্রে ভেসে গেছে, হয়তো একদিন পথ চিনে চিনে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আবার সে স্ত্রী সন্তানদের সংসারে ফিরে আসবে এই আশা নিয়ে জেলে পত্নীরা দিন ফুরায় রাত কাটায়। ভেতরে সব হারানো বেদনা নিয়ে বাইরে সধবার বেশ ধারণ করে থাকে তারা। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। বার বছর পর সধবার সকল বেশ-শাঁখা, সিদুঁর, রঙিন শাড়ি সব ত্যাগ করে ধুতি পরিধান করতে হবে। এটাই জেলে সমাজের অলিখিত অথচ স্বীকৃত প্রথা।" এই লোকাচার পালনের জন্য বিশেষ প্রথা প্রচলিত ছিল।

আঞ্চলিক উপন্যাসের শর্তগুলি হরিশংকর জলদাসের জলপুত্র উপন্যাসে সার্থকরূপ লাভ করেছে। সমস্ত বিষয়বস্তু স্থানিক বেতনায় ঋদ্ধ হয়েছে। উৎসব অনুষ্ঠান, খাওয়া দাওয়া, ভাষা সংস্কৃতি সবই যথার্থ আঞ্চলিক হয়ে উঠতে পেরেছে। হরিশংকর নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসকে সার্থক করে তুলেছেন। ভাষাগত আঞ্চলিকতা একটি আঞ্চলিক উপন্যাস সৃষ্টির মুখ্য উপাদান 'জলপুত্র' উপন্যাসে মূলত দুটি শ্রেণির বাংলা ভাষারীতি ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে হরিশংকর জলদাস মান্য চলিত বাংলার আশ্রয় নিয়েছেন এবং আঞ্চলিক চরিত্র গুলির কথোপকথনে নির্ভেজাল পূর্ববঙ্গীয় বাঙ্গালী উপভাষার চাটিগ্রামী রূপকে ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ উপন্যাসের পুরোটাই আঞ্চলিক উপভাষার লেখা হলে। সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা নাও পেতে পারে। এবং রসের হানি ঘটে। অন্যদিকে পুরোটাই যদি মান্যবলিতে লেখা হয় তাহলে আঞ্চলিক উপন্যাসের local color থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বাস্তবতার অভাব দেখা দেয়। এই কারণেই কৃতবিদ্য হরিশংকর দুটি ভাষার সহাবস্থান করিয়াছেন। কোথাও মিশ্রন ঘটিয়ে শংকর করে তোলেননি। যেখানে মান্যভাষা ব্যবহার করেছেন সেখানে আঞ্চলিক

ভাষা কিংবা শব্দের প্রয়োগ করতে চাননি। আবার যেখানে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন সেখানে কোথাও মান্যভাষা বা তার উচ্চারণ ব্যবহার করেননি। এতে আঞ্চলিকতার স্বরূপটি যেমন যথার্থ হতে পেরেছে তেমনি বিশ্বাসযোগ্যতাও দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিংবা পাঠকও উপন্যাসের রসাস্বাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

James Kelman একদা বলেছিলেন-“language is the culture if you lose your language you have lost your culture, so if you have lost the way your family talk the way your friend talk then you have lost your culture” বস্তুতঃ হরিশংকর একথারই অনুসারী হয়েছে। তিনি নিজের সমাজ সংস্কৃতি ভুলতে চাননি উচ্চশিক্ষিত হয়েও তিনি বরং তাকে যথাযথ ভাবেই প্রকাশ করার বাসনা নিয়েছিলেন আর তা প্রকাশের মাধ্যম ছিল ভাষা তার নিজস্ব চাট্টিগ্রাম কথ্যভাষা। কেন না ভাষা আর আঞ্চলিক জীবন একের সঙ্গে অভিন্নপ্রায়। ‘জলপুত্র’ উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারের মধ্যে একটা গতিশীলতা ও আকর্ষনী শক্তি আছে। উপন্যাসটির সূচনা ঘটেছে মান্য চলিত ভাষা দিয়ে।– “উত্থাল পাতাল বঙ্গোপসাগরের দিকে তাকিয়ে আছে উনিশ বছরের ভুবেনশ্বরী।” এইভাষা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। এবং উপন্যাসের মূল কাহিনি এই ভাষাতেই বিবৃত হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্রগুলি তো সর্বদাই আঞ্চলিক রঙে ভেজানো তাই তিনি উপন্যাসের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রেখে কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। কেননা আঞ্চলিক উপন্যাসের ভাষার অবদান নিয়ে বলা হয়েছে- “ when developing a special character the author likes to give him or as much authenticity as possible by indicating where he is from and how he speak” (8) ফলতঃ হরিশংকর জলদাস স্থানীয়ভাষা ব্যবহার করেছেন চরিত্রের কথায় কারণ এতে উপন্যাসের স্থানিক রঙ পরিস্ফুট হয়েছে সার্থকভাবে। ব্রাত্য ও ভ্রান্তবাসী মানবজীবন অসীম বাস্তবতায় প্রকাশ পেয়েছে। হরিশংকর জানতেন একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ ভাষাকে ঘষামজা করলে তার বাস্তবতার হানি ঘটে ও সত্য থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়ে। সেকারণেই আঞ্চলিক ভাষা প্রকাশে ঘষামাজা করেননি।– “অপুত, আর ইক্কিনি থক্কা।” বঙ্গালী উপভাষার একটি ট্রিপিক্যাল আঞ্চলিক রূপ চাটিগ্রামীতে রচিত হয়েছে এ জাতীয় সংলাপ। এই ভাষাই ছিল চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগরের পতেঙ্গা গ্রামের প্রান্তবাসী কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের ভাষা। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তারা এই ভাষাই ব্যবহার করে যা একান্ত ভাবেই আঞ্চলিক ও স্বাভাবিক। এখানে নদীর সঙ্গে মানুষ একত্রিত হয়ে গেছে কেননা “বাংলাদেশ নদীমার্তৃক দেশ। নদী আর মানুষের জীবন এদেশে যেন একই সূত্রবদ্ধ।” সেকারণেই-আঞ্চলিক ভাষাও এখানে নদীর সঙ্গে একীভূত হয়েছে।

হরিশংকর কৈবর্ত্য পুরুষও নারী উভয়ের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার মাত্রার ভিন্নতাকেও বজায় রেখেছেন- “মনসামঙ্গল’ পুথিঁ পাঠের ‘নাচুয়া নাউট্যাপোয়া’ কে নিয়ে পুরুষ নারীর অনুভূতি ও প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। হরিশংকর এই মাত্রিকতা বজায় রাখার জন্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারকেও মাত্রাগত ভাবে করে আঞ্চলিক বাস্তবতাকে উচ্চতর স্থানে নিয়ে গেছেন। গণ্যমান্য অন্নচরন নাউট্যাপোয়াকে দেখে মন্তব্য করেছেন- “গত পাঁচ বছরত প্রেমদাইস্যার মতো নাউট্যাপোয়া এই গেরামত না আইয়্যে।” অন্যদিকে পতিনবুড়ি তার নাচ দেখে মুগ্ধ ও আবেগবিহ্বল। সে সেই মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন আঞ্চলিক ভাষায় কিন্তু তার মাত্রায় স্বাভবিকতা বজায় রেখে-“কি সোন্দর নাচ্‌রে বাপ পোয়া ইবার। নাচ দেই এই বয়সতও বুকখান খালি খালি লাফার।” বিষয়টা একই। প্রেমদাশের নাচ মনসার পুঁথি পাঠ উপলক্ষে। কিন্তু একই আঞ্চলিক রীতি ব্যবহার করলেও অনুভূতির মাত্রার ভিন্নতার জন্য আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগেও ভিন্নতা এসেছে। এতে আঞ্চলিকতা যথার্থ বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সমুন্নত শিখর স্পর্শ করেছে।

প্রেমদাস প্রতিদিন নাচের শেষে ‘ছাভাপোয়াদের কামনাবাসনা’ মেটায়।’ এই নিয়ে দুই দাবিদার-এর মধ্যে রেষারেষি চলে। এই মনকষাকষির বিষয়টা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করেছেন আঞ্চলিক ভাষায়। সুবল যখন বলেছে “প্রেমদাইস্যা আজিয়া আঁর” তখন চন্দ্রমোহন সেকথা মানতে চায়না। ফলে মধ্যস্থতা করতে উপেন্দ্রকে- “প্রেমদাইস্যা আজিয়া সুবল্যারলাই থাউক । কালিয়া পুঁথিপাঠ অইতো না। গোডা রাইত প্রেমদাইস্যারে তুই বাইত

পারিবি।" এইভাষা একান্ত ভাবেই আঞ্চলিক ও চরিত্র সম্পৃক্ত। আঞ্চলিক বর্ণে এই ভাষা বর্ণাঢ্য। কথোপকথনগুলিতে ঔপন্যাসিক সুনির্দ্দিষ্ট মাত্রা বজায় রেখেছেন ।

হরিশংকর জলদাস আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার কোথাও মাজাঘষা করেননি। আঞ্চলিক মানুষ ও তার ভাষাকে অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আঞ্চলিক উপভাষাকে ঘষামাজা করলে তার বাস্তবতা তথা আঞ্চলিক ছাপ নষ্ট হয়ে যায় এবং অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় আঞ্চলিক রঙের প্রকাশ। ফলে অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ থেকেও তিনি বিরত থাকেননি। দুঃসাহসিক মনন ও প্রখর বাস্তবতাকে তিনি সত্যের নির্বিশেষ আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। শিক্ষিত পাঠকের কাছে অস্বস্তিকর হলেও হরিশংকর গাল্সি বা অশ্লিল শব্দকেও মাত্রা ও চরিত্রের অভিমুখ অনুসারে ব্যবহার করেছেন। হরিশংকর জলদাস নিম্নবর্গীয় প্রান্তবাসী মানুষের প্রতিভূ। সমাজ পরিবেশের ভিন্নতার ভাষাগত ভিন্নতা লক্ষ করা যায় । কেননা ভাষা সংস্কৃতিকে ভাবা অসম্ভব। তাই পতেঙ্গাঁ সমুদ্র তীরবর্তী কৈবর্ত্য সমাজের ভাষার ব্যবহারে অসীম বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি,

গৌরাঙ্গ সাধু যখন তার প্রিয় মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে গৃহে কীর্তন গায় তখন পাড়ার কিছু 'পোলাপান' তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। গৌরাঙ্গ সাধু তার ক্রোধকে প্রশমিত করতে না পেরে অশ্লিল ভাষায় গালি দেয়। হরিশংকর এই নিম্নবর্গীয় আঞ্চলিক চরিত্রটি আঁকতে গিয়ে তার ভাষাকেও হুবহু তুলে ধরেছেন কোনও রকম কাঁটাছেঁড়া ছাড়াই। - "ধুত্তোবার মারে চুদি। অ খানকির পোয়াঅল। আঁই তোরার কি ক্ষতি গজ্যি? তোরা আঁর পিছদি নাইগ্যাচ দে কিলল্যাই।" তখন এই ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালিনতা বর্জিত বলে মনে হয়। কিন্তু হরিশংকর জলদাসের এই প্রয়োগ অসীম সাহসীকতার নিদর্শন । কেননা তিনি জানতেন নর্দমার পাঁককে কখনোই গঙ্গার পলিমাটি করে দেখানো উচিৎ নয় এতে অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্তি ঘটলেও আঞ্চলিক রং বর্ণহীন হয়ে যেত এবং অবাস্তব হয়ে উঠত কৈবর্ত্যদের গ্রামীণ জীবনের দৈনন্দিন জীবনচর্চার বাস্তবতা। যে কোন ভ্রান্তবাসী বা নিম্নবর্গীয় মানুষের কথোপকথনে মার্জিত রূপের অভাব অনেক সময়ই স্বাভাবিক ভাবেই লক্ষগোচর হয়। কোনও কোনও সাহিত্যিক ভদ্রতার আড়ালে সেটিকে গোপন করে প্রকাশ করেন। হরিশংকর জলদাস একজন অধ্যাপক ও গবেষক তার কাছে কৈবর্ত্য জীবন এসেছে গবেষকের কলমে ও অধ্যাপকের দৃষ্টিতে তাই তিনিও নির্ভেজাল গালিকে ব্যবহার করেও তার ব্যাখ্যা করেছেন গৌরাঙ্গ সাধুর সত্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। গৌরাঙ্গ গালি দিয়েও তার অশালীন ব্যবহার লজ্জিত হয়েছে এবং ঈশ্বরের কাছে তার এই আচরণের জন্য মাপ চেয়েছে- "এই জৈবিক গালিগুলি দিয়ে গৌরাঙ্গ সাধু নিজেই ভয়ানক অপরাধ বোধে আক্রান্ত হন।" গৌরাঙ্গ সাধুও তার অপরাধ বুঝতে পেরে আত্মবিশ্লেষণ করেন- "হে কৃষ্ণ, আঁরে মাপ গড়ি দিও। এই জাউল্যার পোলা মাইয়া অলে আর জীবন গানের বিষয়ে তুইল্যো। আঁই আর রাগেরে নিজর ভিতর ধরি রাইত ন পারি। আঁই উগগা অমানুষ। হেতল্যাই পশুর মতো আচরণ গড়ি।" এই ভাষা একটি চরিত্রের বহুমাত্রিকতার রূপটিকে তুলে ধরে আঞ্চলিকতার পরিপ্রেক্ষিতে। অনেক লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানী গালিকে লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত বলে মনে করেন এবং এর প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করেন এবং গালাগালির মধ্য দিয়ে আঞ্চলিকতার প্রকাশ ঘটে। গালির প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে অনেকেই মনে করেন গালি মূলত কোনও ব্যক্তি ব্যবহার করেন ক্রোধ এবং উত্তেজনার বসে এবং তার স্থান কাল পাত্র ও ভিন্ন। গালি প্রদানের মাধ্যমে মানুষ বিজয়ীর গর্ব অনুভব করেন এবং শান্ত হয় । এতে শারিরীক ও মানসিক ভাবে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। বিশ্বের সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই গালি প্রচলিত আছে। তাই গালিকে অনেকেই আঞ্চলিক রঙ এর যথার্থ প্রকাশ বলে মনে করেন। হরিশংকর জলদাস অন্যত্র ও এমন গালির ব্যবহার করেছেন চরিত্রের কথোপকথনে- "ও হালার পুত বোদানির পোয়াঅল।বেইন্যাত্তোন কাম গহত্যৈ গহত্যৈ জান বাইর ওই জাইগেই তোরা চোদানির পোয়াঅলেরে জন্ম দিলাম দে কামর সময়ত সাহায্য পাইবার ল্যাই।" কিংবা নতুন বউকে ছেলের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে দেখে বলে উঠেছে বাবা-" হুদা বউ লইয়া ফুতনের চিন্তা।" প্রভৃতি আঞ্চলিক সংলাপ ও ভাষা আপাত অশ্লীল হলেও এটি চরম বাস্তব ও নির্ভেজাল ভাবেই প্রকাশ করেছেন হরিশংকর জালদাস। হরিশংকর আঞ্চলিক দ্রব্যবিশেষের নামও ব্যবহার করেছেন বাঙ্গালী উপভাষা থেকেই। কোথাও মার্জিত শব্দ দিয়ে দ্রব্যের নাম বোঝাননি- "বাজারত যাও। চৈত্র

সংক্রান্তির ছাঁইবিচি সিদ্ধ চাউল আনিবা।" ছঁই মানে সীম। এখানে তিনি প্রচলিত কথা আঞ্চলিক শব্দকেই ব্যবহার করেছেন । এতে আঞ্চলিকতার মাত্রা যথার্থ ভাবেই প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে যেখানে মান্য চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন সেখানেও গ্রামীণ শব্দ প্রয়োগ করেছেন আঞ্চলিক রঙকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করার জন্য।

সেই ভাষা অত্যন্ত সাধারণ এবং পরিস্থিতি উপযোগী অমোঘ শব্দবন্ধ। - "ভোলে কন্যার যখন বিয়ের হয়, তখন সে একেবারেই অপরিপক্ক। ছেলেরাও কৈশোরের গণ্ডি পেরোয় মাত্র। কিন্তু দুটি শরীর কাছাকাছি আসে, শরীর নিয়ে তারা নাড়াচাড়া করে। অসফল চেষ্টায় রত হয় সদ্য তরুণরা। বালিকারা পালিয়ে বেড়ায়। পালিয়ে আশ্রয় নেয় শ্বাশুড়ির কাছে । শ্বাশুড়িও বুঝতে পারে। কারণ তার জীবনেও এরকম একটা সময় গেছে। ফলে শারীরিক ভাবে ভীত বউ শ্বাশুড়ির কাছে প্রশ্রয় ও আশ্রয় পায়। তবে তা বেশি দিনের জন্যে নয়। মহাবুভুক্ষা নিয়ে পুরুষ একদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে বালিকা বধূর উপর। শরীরের আড় ভাঙে। এই আড় ভাঙাভাঙিতে সন্তান আসে পেটে।" বাল্যবিবাহের পরিণতি ও কৈবর্ত্য সমাজে তার প্রভাবকে তিনি সাধারণ ভাষায় সাবলীল ভাবে প্রকাশ করেছেন কোথাও জটিল শব্দ তিনি প্রয়োগ করেননি বরং 'আড়ভাঙ্গা' 'নাড়ভাঙ্গা' ইত্যাদি গ্রামীণ শব্দকে যথার্থভাবেই ব্যবহার করেছেন তার লেখায়। এতে যেমন আঞ্চলিক রূপটি বিকৃত হয়নি তেমনি কৈবর্ত্য সমাজের প্রকৃত স্বরূপটি দ্যোতিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) হরিশংকর জলদাস, 'যেভাবে লেখা হলো উপন্যাসটি' ঢাকা, ২০০১।

২) 'Oxford companion of American literature', the late James, D. Hart with revisions and additions by Philip Leininger , 1991, Oxford University Press.

৩) James wood, 'James Kalman : Away thinking about things James fighting words; August,13, 2014, 'The New yorker'.

৪) Marsha quality 'writing in Dialect of Fiction: A History and Study" Hamlian University.